ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি সমৃদ্ধকরণে সরকারের উদ্যোগ

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

আমরা প্রতিদিন যেসব খাবার খাই তাতে মূলত তিন ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে। ভাত, রুটি, আলু, মিষ্টি আলুসহ বিভিন্ন শস্য জাতীয় উদ্ভিদ হতে প্রাপ্ত খাবার শর্করার উৎস। এসব খাবার আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে। মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের ডাল ইত্যাদি খাবার আমিষের উৎস। আমিষ দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে। ভোজ্যতেল, প্রাণিজ চর্বি, বাদাম, নারিকেল, সরিষা, দুগ্ধজাত খাবার যেমন পনির মাখন ইত্যাদি স্নেহ জাতীয় খাবার তেল বা চর্বির উৎস। শর্করার মতো স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাবারও দেহে শক্তি সঞ্চার করে। এছাড়া এসব খাবার দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, কতিপয় খাদ্য উপাদান শোষণ ও বিপাকীয় কাজে সহযোগিতা করে। তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার মাত্রাতিরিক্ত খেলে দেহ স্থূলকায় আকার ধারণ করে, রক্তনালী সংকুচিত হয়ে উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করে এবং দেহের নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করে। চর্বি জাতীয় খাবার থেকে শর্করার তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপাদন হয়। এক মোল (দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয়ের রাসায়নিক একক) পরিমাণ শর্করা থেকে ৪.৩ কিলোক্যালরি, সমপরিমাণ আমিষ থেকে ৪.৭ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। অন্য দিকে এক মোল পরিমাণ তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দেহে শক্তি উৎপন্ন হয় ৭.৩ কিলোক্যালরি। তাই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দেহে সঞ্চিত খাদ্য বার্ন করে দেহকে স্বাভাবিক রাখতে হলে চর্বিজাতীয় খাবারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে যা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য। এজন্য তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার পরিমিত গ্রহণ করা উচিত। আমাদের আজকের এই আর্টিকেলটি দেহে ভিটামি-এ এবং ভিটামিন-ডি এর গুরুত্ব এর অভাবজনিত জটিলতা ও এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে]আলোচনার উদ্দেশ্যে । এ দুটি খাদ্য উপাদান তেল বা চর্বিতে দ্রবণীয় এবং তেল বা চর্বির মাধ্যমেই আমাদের দেহে প্রবেশ করে। অর্থাৎ তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার একেবারে পরিহার করলে অন্যান্য অনেক পুষ্টি উপাদানের ন্যায় দেহ প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ ও ভিটামিন ডি থেকে বঞ্চিত হবে।

আমরা দৈনন্দিন খাবারের মধ্যে শাকসবজি ও ফলমূল থেকে ভিটামিন ও খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। এ দুটি উপাদান দেহকে কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে। ভিটামিন ও খনিজ লবণ দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সাধারণভাবে আমাদের দেহে দুইশ'রও বেশি ভিটামিন প্রয়োজন হয়। বেশিরভাগ ভিটামিন দেহে সঞ্চিত থাকে না। তাই দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এসব ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাদ্য তালিকায় রাখতে হয়। কিছু কিছু ভিটামিন জাতীয় উপাদান পানিতে দ্রবণীয়। এসব ভিটামিন শর্করা বা আমিষ জাতীয় খাবারের মাধ্যমেও দেহে প্রবেশ করতে পারে। তবে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি, তেল বা চর্বিতে দ্রবণীয় হওয়ার কারণে একমাত্র এ জাতীয় খাবারের মাধ্যমেই ভিটামিনদ্বয় দেহে প্রবেশ করে।

ভিটামিন-এ এর রাসায়নিক নাম রেটিনল। এটি চর্বিতে দ্রবণীয় একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান। ভিটামিন-এ দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা, দৃষ্টি শক্তি (বিশেষ করে স্বল্প আলোতে) স্বাভাবিক রাখে, কোষের বৃদ্ধি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বজায় রাখে, শরীরের বিভিন্ন কোষের কার্যকারিতা স্বাভাবিক রাখে। আমাদের চোখের রেটিনাতে রড কোষ ও কোন কোষ নামে দুই ধরনের আলোক সংবেদী কোষ রয়েছে। রড কোষের কার্যকারিতা রডোপসিন নামক প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। আর কোন কোষের কার্যকারিতা আয়োডপসিন নামক প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। রড কোষ মৃদু আলো এবং কোন কোষ তীব্র ও স্বাভাবিক আলোতে চোখে দর্শনানুভূতি সৃষ্টি করে। রডোপসিন অত্যন্ত আলোক সংবেদনশীল বেগুনি রঞ্জক প্রোটিন যা অপসিন এবং ১,১ সিস রেটিনল (ভিটামিন এ থেকে প্রাপ্ত) নামক প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত এবং আলোর উপস্থিতিতে দ্রুত বিক্রিয়া শুরু করে স্নায়বিক সংকেত তৈরি করে। ভিটামিন-এ এর অভাবে ১,১ সিসি রেটিনালের প্রাপ্যতা হ্রাস পায়, ফলে অপসিনের সাথে বিকিয়ায় রডোপসিনের সংশ্লেষ হ্রাস পায়, ফলে রড কোষের কার্যকারিতা কমে যায়। অর্থাৎ মৃদু আলোতে চোখে দর্শণানুভূতি জন্মাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। ফলে যাদের দেহে ভিটামিন-এ এর ঘাটতি থাকে তারা রাতের বেলায় মৃদু আলোতে চোখে দেখতে পায়না। একে রাতকানা রোগ বলে। দেহে ভিটামিন এ এর অভাবে রাতকানা রোগের মতো আরও অনেক সমস্যা তৈরি হয়। যেমন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, শ্বাসতন্ত্রে ত্রুটি দেখা দেয়, অপনিগত শিশুর জন্মায়, নারীর বন্ধাত্ব বা গর্ভধারনে সমস্যা ও শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার মতো জটিল সমস্যা তৈরি হয় ভিটামিন-এ এর অভাবে।

সাধারণত হলুদ ফল ও সবুজ শাক হতে আমরা ভিটামিন এ পেয়ে থাকি। আম, কাঁঠাল, পেঁপে ইত্যাদি পাকা ফল, কলমি শাক, পালং শাক, ঢেঁকি শাক ইত্যাদি ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এসব খাবার থাকলে শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাস, এসব খাবারের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে এদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশুদের একটি বিরাট অংশ এ ভিটামিনের অভাবে থাকে। ভিটামিন ডি এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরল যা মূলত চর্বিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন। ভিটামিন ডি-২ (কোলেক্যলসিফেরল) ও ডি-৩ (আর্গোক্যালসিফেরল) ত্বকে বিদ্যমান তেল বা চর্বি হতে সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে সংশ্লেষিত হয়। এ ভিটামিন হাড়ের ক্যালসিয়াম ও ফসফেট শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

হাড়ের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। সেই সাথে এই ভিটামিন দাঁত শক্ত রাখে, পেশী সক্রিয় রাখে ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট স্ট্যাটাস সার্ভে ২০১৯-২০ অনুযায়ী পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে ২২ শতাংশ এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নন এমন নারীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ ভিটামিন ডি এর ঘাটতি দেখা গেছে। ২০১১-২০২২ সালে এর হার ছিল যথাক্রমে ৪০ শতাংশ এবং ৭২ শতাংশ। শহর ও গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পরিচালিত এক গবেষণায় ৬৩ শতাংশ ভিটামিন ডি এর অভাবের প্রাদুর্ভাব রিপোর্ট করা হয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যালোচনা বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও ভিটামিন ডি এর ঘাটতির উচ্চ প্রকোপতা রিপোর্ট করেছে।

ভিটামিন ডি-এর অভাবে শিশুদের রিকেটস (হাড় দুর্বল হওয়া বা বেঁকে যাওয়া) হতে পারে, গর্ভাবস্থায় মাতৃত্বজনিত জটিলতা যেমন প্রি এক্লাপাসিয়া, গ্লুকোজ সহনশীলতা কমে যাওয়া, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, সিজারিয়া সেকশনের হার বৃদ্ধি পাওয়া, নবজাতকের খিঁচুনি, শিশুর ফুসফুসের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, বয়স্কদের অস্টিওপোরেসিস, পেশীর দুর্বলতা, সাধারণ ব্যথা, শরীরের ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হয়ে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগ যেমন হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্তন, কোলন ও প্রোস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দেহের মোট চাহিদার ৮০-৯০ শতাংশ ভিটামিন ডি সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ ও মাছের তেল, মাশরুম (সূর্যালোকের সংস্পর্শে এসেছে এমন) ইত্যাদি খাবার ভিটামিন ডি-এর উৎস। ভিটামিন-এ ও ডি এর প্রয়োজনীয় চাহিদা আমাদের দৈনন্দিন খাবারের মাধ্যমে পূরণ না হওয়ায় শরীরে এর ঘাটতি তৈরি হয়। ফলে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শিশুদেরকে বিনামূল্যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো শুরু হয়। তখন অপুষ্টিজনিত রাতকানা রোগ প্রতিরোধের জন্য এ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে এ কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১০ সাল থেকে নিয়মিত (বছরে দুইবার) জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সারাদেশের সকল শিশুকে বিনামূল্যে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ৬-১১ মাস বয়সি শিশুদের ১০০০০০ IU (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) মাত্রার একটি নীল রঙ্গের ক্যাপসুল এবং ১২-৫৯ মাস বয়সি শিশুদের ২০০০০০ IU মাত্রার একটি লাল রঙের ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভিটামিন এ ও ডি এর অভাব পুরণে জন্য সরকার ২০১৩ সালে ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণ ও ভিটামিন এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল বিক্রয়, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন বা বাজারজাতকরণ বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন অনুযায়ী উৎপাদনকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে ভোজ্যতেলে ১৫-৩০ পিপিএম (Parts per million) অর্থাৎ প্রতিগ্রাম ভোজ্যতেলে ০.০১৫-০.০৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন এ মিশিয়ে সমৃদ্ধকরণ করতে হবে। সেই সাথে বাজারজাতকরণের পূর্বে এর বোতল, টিন কিংবা প্যাকেটে ভিটামিন এ সমৃদ্ধকরণের (Fortification) লোগো সাদা-কালো কিংবা রঙিন প্রিন্টে ছাপাতে হবে।

কোনো আমদানিকারক উপর্যুক্ত মাত্রায় ফর্টিফিকেশনবিহীন কোনো ভোজ্যতেল আমদানি করতে পারবে না। একই সাথে কোনো বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান এই মাত্রার ফর্টিফিকেশনবিহীন ভোজ্যতেল সংরক্ষণ, বিক্রয়, পরিবেশন বা প্রদর্শন করতে পারবে না। আইন অনুযায়ী, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বাণিজ্যিকভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারী কোনো প্রতিষ্ঠান ভিটামিন এ সমৃদ্ধ নয় এমন ভোজ্যতেল ব্যবহার করতে পারবে না। ভিটামি এ সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল (পরিমিত পরিমাণ) ব্যবহার করলে একদিকে ভিটামিন এ এর চাহিদা পূরণ হবে অন্যদিকে দেহে তেল/চর্বি জাতীয় উপাদান সঞ্চিত হবে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এই চর্বি বা তেল জাতীয় উপাদান দেহে বিশ্লিষ্ট হয়ে ভিটামিন-ডি সংশ্লেষিত হবে। ফলে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ ভোজ্যতেল দেহে একাধারে ভিটামিন এ ও ডি এর অভাব পূরণ করবে। তাই সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি উভয় উপাদানই যুক্ত করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফিনল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তানের মতো দেশও ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি সমৃদ্ধকরণ বাধ্যতামূলক করেছে। বাংলাদেশে ভিটামিন এ ও ডি এর ঘাটতি একটি বহুমুখী সমস্যা, জনস্বাস্থ্যের উপর যার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে সাপ্লিমেন্টের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিসহ ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম প্রয়োজন। ভোজ্যতেলে ভিটামিন এ ও ডি সমৃদ্ধকরনে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু আইন করে বা বাধ্য করে এ সমস্যা সরকারের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য সরকার-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসায়ী, সামাজিক সংগঠন এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতনতা ও তৎপরতা প্রয়োজন। পাশাপাশি আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুস্থ জাতি গঠনে আমরা সফল হব এমনটাই প্রত্যাশা।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার